আয়না

কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি

মূল: আফজাল গুরু

রূপান্তর: মহিউদ্দিন কাসেমী

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

আয়না

কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রচ্ছদ
ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক
আমাদেরবই ডট কম
দোকান নং: ০৪, ২য় তলা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

মূল্যঃ ৩২০ [তিনশত বিশ] টাকা

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Ayna : Kashmirer Sadhinotar Proticchobi by Afzal Guru, Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
Price: 320 Taka , 10 US$

উৎসর্গ

ওই শহীদগণের নামে যারা নিজেদের রক্তের মাধ্যমে এবং ওই লেখকগণের নামে যারা নিজেদের কলমের কালির মাধ্যমে জাতি ও গোষ্ঠীর আত্মোপলব্ধি তৈরি করতে সচেষ্ট রয়েছেন।

মোহাম্মদ আফজাল গুরু

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আয়না (প্রতিবিম্ব)

মুমিন মুমিনের জন্য আয়না সদৃশ। একে অন্যকে তারা নিজেদের মধ্যেই দেখে থাকে। তা দেখে নিজেদের সুসজ্জিত করে ও সংহত করে। নিজের আত্মিক জগতকে বাহ্যিক জগত এর মত পরিচ্ছন্ন করে তোলে। নিজেদের চিন্তা চেতনা ও অনুভূতি ইত্যাদিতে সমতা অনুভব করে। ত্রুটি ও বিচ্যুতিসমূহকে সংশোধন করে নিজেদের গুণাবলী ও চেতনাবোধকে শক্তিশালী করে। মুমিনের প্রতিটি আচরণ প্রতিটি কথা তার প্রতিটি মুহূর্তই হয়ে থাকে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। হাস্যোজ্বল থাকে তার বদন।

মুমিন ব্যক্তি এমন ঐশী আধ্যাত্মিক পরিবারের সদস্য যা হযরত আদম, নুহ, মুসা আ. ও মুহাম্মদ সা. এর ধারাবাহিকতায় চলে আসছে। মুমিন ব্যক্তি পৃথিবীতে হয় আল্লাহর নিদর্শন, মুমিন ব্যক্তিকে দেখে স্মরণ আসে আল্লাহর। মুমিন পৃথিবীতে হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ, যার সাথে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা পোষণ করেন উর্ধ্বজগতের সদস্যরাও। রাসুল সা. ইরশাদ করেন মুমিনের দূরদর্শিতাকে ভয় করো, কেননা সে আল্লাহর আলোয় দেখতে পায়। আল্লামা ইকবাল বলেন, মুমিনকে হয়তো তোমরা কুরআনের পাঠক হিসেবে দেখছো, কিন্তু বস্তুত সে নিজেই কুরআনে কারীমের মুখপাত্র।

মুমিনের দৃষ্টি

১৯৯৮ খৃ. পর্যন্ত আমার জীবন ছিল উদ্দেশ্যহীন। কিন্তু একটি সাক্ষাৎ একটি দৃষ্টি আমার জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। যে দৃষ্টি ছিল একজন মুমিন, একজন সংগ্রামী, খোদাভীরু দরবেশ শহীদ গাজিবাবা র. এর। নসীম হিজাযীর গ্রন্থসমূহে আমি যেই মুজাহিদগণের আলোচনা পড়েছিলাম যেন তাদের মধ্যে কেউ একজন আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন।

গাজিবাবা শহীদ

যদি গাজী বাবা শহীদ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয় তাহলে তা এমন হতে পারে যে, তিনি ছিলেন তার গুণাবলী কথাবার্তা ও কাজকর্মে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের প্রতিবিম্ব। তার একাকীত্ব থাকত চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণায় ভরপুর। আল্লাহর ভয় ব্যতিত তার চেহারায় কখনো কারো ভীতি পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি ধর্ম ও জাতির মর্যাদা রক্ষায় সর্বদা চিন্তা করতেন ও এ নিয়েই কথা বলতেন। সামরিক চিন্তাচেতনা তার মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে বিরাজমান ছিল। হাস্যজ্জ্বল আন্তরিক আচরণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল আত্মোৎসর্গ একনিষ্ঠতা ও অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা। তিনি ছিলেন সেই আয়না যা আমাকে আমার সাথে পরিচিত করিয়ে দিয়েছে।

একনিষ্ঠ ভাবে কোনো জিনিস খোঁজা হলে তা পাওয়া যায়

১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজের লেখাপড়া শেষ করে আমি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মুজাফফরাবাদে চলে যাই। সে সিদ্ধান্তের পেছনে যতটা না বেশি কাজ করেছিল বাস্তবতার অনুভূতি এর চাইতে বেশি কাজ করেছিল জজবা ও উদ্দীপণা। এদিকে কাশ্মীরের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে বিরাজ করছিল পারস্পরিক দ্বন্ধ, প্রসিদ্ধির মহড়া, আন্দোলনকে জীবিকা বানানোর মানসিকতা, একনিষ্ঠতা ও আত্মোৎসর্গের মানসিকতার অনুপস্থিতি, নিয়মশৃঙ্খলাহীনতা ও কর্ম পদ্ধতি ও লক্ষ্যের অনুপস্থিতি। এসব কারণগুলো শুধু আন্দোলনকেই স্তিমিত করে দেয় নি বরং এসবের কারণে চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতাও প্রভাবিত হয়েছিল। এদিকে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা-চেতনা, অত্যাচার ও ব্রাহ্মণবাদী আচরণ ও পলিসিতে কোন ধরনের পরিবর্তন আসেনি। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল স্বস্থানে বহাল।

বাহকের বাহন প্রয়োজন, চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ প্রয়োজন। আর তজ্জন্যে সর্বদা মানসপটে অন্বেষণের তীব্রতা ও চাহিদাও প্রয়োজন। নিজের ধর্ম ও জাতির অবমাননা ভিতরে ভিতরে আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। আর এই অন্বেষণের তীব্রতা ও চাহিদাই একদিন আমাকে গাজিবাবা শহীদ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সত্যিকারের অন্বেষণ মানুষকে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

গাজিবাবা শহীদের জীবনাচার

প্রথম সাক্ষাতেই যেন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। গাজিবাবা শহীদকে কাছ থেকে তারা দেখেছেন তারা হয়তো অনুধাবন করতে পারবেন যে আমি এতে কোনো অতিশয়োক্তি করিনি। গাজিবাবা শহীদের সাথে আমি কাশ্মীর অঞ্চলের যে জায়গাগুলোতে কাটিয়েছি সেখানের সবাই যেন বলত যে, আমরা গাজিবাবা শহীদের জন্য নিজেদের বাসস্থান তো সাধারণ কথা বরং নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

নিঃসন্দেহে যে সকল লোকেরা ঈমান আনয়ন করে ও নেক আমল করে মহান আল্লাহ প্রতিটি মাখলুকের অন্তরে তাদের জন্য ভালোবাসা তৈরী করে দেন। [সূরা মারইয়াম : ৯৬]

গাজীবাবা শহীদ কাশ্মীরের প্রতিটি অলিগলি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। একজন সাধারণ মুজাহিদ হতে নিয়ে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাওয়া পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই তার কর্মকান্ডে কোন প্রভাব পড়েনি। আর এর জন্য তিনি নিজের উপর পারিবারিক একান্ত জরুরী বিষয়গুলো ছাড়া নিজের জীবনের প্রতিটি ভোগবিলাস বিসর্জন দিয়েছিলেন। নম্রতা, লাজুকতা, আত্মমর্যাদাবোধ, দৃঢ়সংকল্প, নিয়মতান্ত্রিকতা ও অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা যেন তার কাজে কর্মে প্রতিটি ছন্দে পরিলক্ষিত হত। তার সঙ্গই যেন একজন কাপুরুষকে পরিণত করতো সাহসী সৈনিকে, একজন বেয়াদবকে পরিণত করত শিষ্টাচারী মানবরূপে। পানাহার, চলাফেরা, কথাবার্তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি শরীয়তের নীতিমালাকেই প্রাধান্য দিতেন।

একদিন আমি গাজী বাবাকে দেখলাম একজন বৃদ্ধা মহিলাকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত যার ছেলে বা নাতি শাহাদাতবরণ করেছিল তাকে শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে গভীর ভাবে বোঝাচ্ছেন। শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্খা, চেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুভূতি যেন গাজিবাবা শহীদের রক্তে মিশে গিয়েছিল। কোন কর্মযজ্ঞ শেষ হতে না হতেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন দ্বিতীয় কোনো কর্মসূচিতে।

যে রাস্তা, অলিগলি বা পাহাড়-পর্বতে তিনি ঘুরতেন তাতে সারাদিনই তার মধ্যে বিরাজ করত সামরিক চিন্তা ভাবনা। প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি উপকরণ ও প্রতিটি মাধ্যম, প্রতিটি আচরণেই যেন তিনি দেখতেন সামরিক

বিষয়াবলী। সামরিক কর্মসূচি কিভাবে কঠোর থেকে কঠোরতর করা যাবে তাতে থাকতেন তিনি সর্বদা সচেষ্ট। নতুন কর্মসূচি, নতুন পন্থা, শত্রুদের উপর নতুন ভাবে আক্রমণের কৌশল সম্পর্কে তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। নিজের একনিষ্ঠ সহযোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন পরামর্শ করতেন। শত্রুদের নেতৃবৃন্দ ও বড় বড় সামরিক কর্মকর্তাদের ব্যাপারে নিয়মিত সংবাদ সংগ্রহ করতেন। তাদের কর্মসূচি ও নীতিমালা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে কোন অলসতা করতেন না।

পবিত্রতার তিনি ছিলেন যেন এক জীবন্ত উপমা। শীতের তীব্রতা যতই হোক না কেন সদা অজু অবস্থায় থাকতেন। ফজরের পর থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত তেলাওয়াতে নিমগ্ন থাকতেন। একদা এক উঁচু পাহাড়ের ঘাঁটিতে ফজরের নামাজের পর আমরা সবাই শুয়ে পরেছিলাম। শীতের তীব্রতা ছিল বর্ণনাতীত। তখনো গাজিবাবা শহীদকে দেখছিলাম অশ্রুসিক্ত নয়নে পবিত্র কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করে যাচ্ছেন। কোন পরামর্শ বা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য একত্রে বসলে তার শেষে বিশেষ করে দুরুদে ইবরাহিমী ও দোয়া পড়তেন। তার দোয়ায় সর্বদা এ প্রার্থনা থাকতো 'হে আল্লাহ আমাদের শহীদদের পবিত্র রক্তের সাথে বিশ্বাসের আচরণ করার তাওফিক দিন'।

অশ্রুসিক্ত নয়ন, বিনয়ী অঙ্গভঙ্গি ছিল তার প্রার্থনার একান্ত সঙ্গী। মহান আল্লাহ কবুল করেছিলেন তার প্রার্থনা, তাকে দান করেছিলেন শাহাদাতের পবিত্র মর্যাদা।

নেতৃত্বের অপেক্ষায় কাশ্মীর আন্দোলন

গাজিবাবা শহীদ কাশ্মীর আন্দোলনের একনিষ্ঠ এমন যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সবকিছু এড়িয়ে নিজেদের একমাত্র মহান আল্লাহর রাহে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক দলাদলি, দর্শনগত ভিন্নতা, মতবিরোধ, গোয়েন্দাবাহিনী সমূহের সাথে দ্বিচারিতাপূর্ণ সম্পর্ক কাশ্মীরের জনসাধারণের বিশ্বাসহীনতা ও নামসর্বস্ব নেতৃবৃন্দের সাথে তৈরী হওয়া তাদের পারস্পরিক দূরত্ব সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। একদিন আমি গাজিবাবাকে বলছিলাম যে, তার তো কাশ্মীরের পরিবর্তে আফগানিস্তান বা অন্য কোন অঞ্চলে চলে যাওয়া উচিত। উত্তরে তিনি বলেন, কেন? আমি

বললাম যে, এখানে কোন বিশেষ নেতৃত্ব নেই বা এখানে সামরিক কর্মকান্ড পরিচালনার এমন কোন রূপরেখা নেই যাকে সামনে নিয়ে কোন সফল পদক্ষেপ নেয়া যায়। অধিকাংশ লোকেরাই সামরিক কর্মকান্ডের ব্যাপারে উদাসীন। আল্লাহর এই সাহসী সৈনিক আমাকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। তিনি বলেন কাশ্মীরের প্রতিটি ঘর প্রতিটি অলিগলি প্রত্যক্ষ করেছে যে, জনসাধারণ সংগ্রামের সঙ্গ দিচ্ছে, যুবকরা নিজেদের আত্মোৎসর্গ করছে, যদি কোন ধরনের ত্রুটি থেকে থাকে তা হচ্ছে নেতৃত্বে ত্রুটি। সামরিক নেতৃত্বের ত্রুটি। তিনি সর্বদাই চেষ্টা করতেন যেন যুবকরা মুজাফফরাবাদ যাওয়ার পরিবর্তে কাশ্মীরেই সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। যেন এই অঞ্চলের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। ব্যবহারিকভাবে ও তিনি এ নীতিমালার উপর আমল করতেন।

সরকারি গোয়েন্দা বাহিনীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিরুপ এবং তাদের মুনাফিকি সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করতেন। আমি যতবারই তার সাথে সাক্ষাত করেছি প্রতিবারই যেন ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস এর দৃঢ়তা তৈরী হয়েছে আমার মধ্যে।

তার মজলিস তার প্রতিটি বৈঠকেই যেন থাকতো একটি আধ্যাত্মিকতার ছাপ। তার চেহারায় সদা থাকতো ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ভালোবাসা ও আন্তরিকতার ছাপ। মহান আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসার কারণে তারমধ্যে সদা আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা বিরাজ করত। প্রতিটি সিদ্ধান্তই তিনি নিতেন আত্মবিশ্বাসের সাথে।

> অতঃপর যখন কোন কাজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে ভরসা করবে আল্লাহর উপর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন তাদের যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে। সুরা আলে ইমরান : ১৫৯

প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি প্রতিদিন সহযোদ্ধাদের মতামত নিতেন, তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। দুনিয়াতে মানুষের সবচাইতে বড় দায়িত্ব, আবশ্যক বা ফরজ কাজ সমূহ আদায় করা। ফরজ আদায়ের অর্থ হচ্ছে, যে কোন সময়ের চাহিদা পূরণ করা। কেননা যে ব্যক্তি সময় হারিয়েছে, সময়ের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি, সময়ের ডাকে সাড়া দিতে পারেনি বরং অবহেলা ও অলসতা করেছে সে যেন সবকিছু হারিয়েছে। সময় কখনও

কাউকে ক্ষমা করে না। সময় এক তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারির মত, যদি আপনি সেটাকে না কাটেন তাহলে সেটা আপনাকেই কেটে ফেলবে।

ঈগলের জীবন

গাজিবাবা শহীদ প্রতিটি মুহূর্তে সামরিক কর্মকান্ড বা এবাদতে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি ব্যবহারিক ভাবেই নিজের কর্মকান্ডের মাধ্যমেই আমাদের তারবিয়াতের কাজ করতেন। আমি কখনো তার মুখে এমন কোনো কর্মসূচির কথা শুনিনি, যার উপর তিনি প্রথমে ব্যবহারিক ভাবে আমল করেননি। তিনি যা করতেন তাই বলতেন এবং তিনি সেটাই বলতেন যা তিনি নিজে করতে সক্ষম ছিলেন। তিনি কখনো বড় বড় ধরনের কর্মসূচি হাতে নিতেন না। প্রথমে একটি কাজ সমাধা করে তারপরেই দ্বিতীয় কাজটি তিনি হাতে নিতেন। আর এসবের কারণেই তাকে আমি সদা একজন পরিপূর্ণ সফল মানুষ হিসেবে পেয়েছি। সর্বদাই তিনি অল্পস্বল্প অস্ত্রের মাধ্যমে বড় ধরনের সফল অপারেশন আঞ্জাম দিতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামরিক কর্মকান্ডসমূহে তিনি নিজে স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন।

জল স্থল ও আকাশপথের প্রতিটি সামরিক ক্ষেত্রেই তিনি নিয়মানুবর্তিতার পাশাপাশি নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমান যুগের শহুরে যুদ্ধে বা পাহাড়ি সামরিক কর্মকান্ডে শুধু সাহস ও মনোবলই যথেষ্ট হয় না বরং সেখানে নিয়মতান্ত্রিক কৌশল ও বুদ্ধিবৃত্তিসহ বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে হয়। মহান আল্লাহ গাজিবাবা শহীদকে বিভিন্ন আশ্চর্যজনক সামর্থ্য দিয়েছিলেন। শত্রুদের মাধ্যমেই শত্রুদের তথ্যসংগ্রহ ও গোপনীয়তা রক্ষায় তার ছিল অসীম দক্ষতা। যে ঘরে পরামর্শ হওয়ার কথা থাকত সেখানের একজন ছাড়া আর কেউ জানতে পারত না যে সেখানে স্বাধীনতাকামীদের যাওয়ার কথা আছে বা সেখানে পরামর্শ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সব ক্ষেত্রেই তিনি নিজের চাইতে অন্যান্যদের বেশি খেয়াল রাখতেন। সদা গোপনীয়তার সবক শেখাতেন। কোন অঞ্চলের তার একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্খী ও অপর হিতাকাঙ্খীর পরিচয় জানত না। দীর্ঘ ১১ বছর তিনি কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। প্রতিটি জঙ্গল, প্রতিটি পাহাড়ই ছিল তার বাসস্থান।

'তিনি তার প্রতিটি সময় কাটিয়ে দেন পাহাড়ে জঙ্গলে, কেননা পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করা ঈগলের জন্য লজ্জাজনক।'

তিনি ছিলেন ঈগল চরিত্রের একজন সাহসী বীর যোদ্ধা। পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করে যেন তার চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্যগুলো পাহাড়ের মতই সুউচ্চ হয়েছিল। মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পবিত্র ও সাদাসিদা। সঙ্গীদের উপর তিনি সদা ভরসা রাখতেন। সঙ্গীদের বিভিন্ন কাজ কর্ম ও দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের যোগ্যতা ফুটিয়ে তোলার সুযোগ দিতেন। বাস্তবতা বিবর্জিত কোন কথা তিনি কখনো বলতেন না। ক্রিকেটসহ বিভিন্ন অবান্তর বিষয় নিয়ে কথা বলতে বারণ করতেন। স্রষ্টা প্রদত্ত সৃজনশীল বিভিন্ন কাজে নিজেকে ও সাথিদেরকে নিয়োজিত রাখতেন।

প্রতিটি ব্যক্তির সাথে তার যোগ্যতা সামর্থ্য ও বুদ্ধি অনুযায়ী কথা বলতেন। সে অনুযায়ী তাদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করতেন। চারিত্রিক পূর্ণতা, মনস্তাত্ত্বিক পবিত্রতা ও উন্নতির গুণাবলী নিজের মধ্যে ও সঙ্গীদের মধ্যে তৈরি করার জন্য সদা আলোচনা করতেন। সিগারেট তামাকসহ অন্যান্য বাজে নেশা কখনো সহ্য করতেন না। কিন্তু উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বদা একজন প্রিয় বন্ধুর ন্যায় আচরণ করতেন। নিজের মধ্যে ও সঙ্গীদের মধ্যে সর্বদা শাহাদাতের চেতনা জাগিয়ে তুলতেন। সামরিক ক্ষেত্রে নিত্যনতুন কলা-কৌশল আবিষ্কার হয়েছিল যেন তার নেশা।

পরিচয় বিমুখতা

১১ বছর কাশ্মীরের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সামরিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও গোয়েন্দা সংস্থা IB বা সামরিক অন্যান্য কর্মকর্তারা তাকে চিনতে পারত না। গ্রেপ্তার হওয়া তো দূরের কথা। মানুষের সামনে দেখানো বা প্রসিদ্ধিলাভের পরিবর্তে প্রচার বিমুখতাই ছিল তার আদর্শ যা অন্যান্য সংগঠনগুলোর নেতাদের মধ্যে দেখা যেতো সম্পূর্ণ এর বিপরীত আচরণ। বাস্তবিক অর্থেই তিনি ছিলেন একজন দুনিয়াবিমুখ সাধক।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে বিক্ষিপ্ত চুল ধুলো মলিন চেহারা, পুরানো পোশাক পরিহিত বহু লোক যাদের মানুষের দরজা থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যাদেরকে মানুষেরা চিনে না, যারা হারিয়ে গেলেও কেউ খোঁজ নিতে যায় না, তারা মানুষের অধিকার পূরণ করেন কিন্তু তাদের অধিকার কেউ পূরণ করে

না। কিন্তু তারা আল্লাহর ভরসায় যখন কোনো কসম করে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার পুরো করে দেন। তারা হেদায়েতের আলো হয়ে বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরতে থাকেন এবং মানুষদের বিভিন্ন বিপদাপদ অন্ধকার থেকে মুক্তি দান করেন। (তাবরানী, হাকিম।)

গাজিবাবা শহীদ কাশ্মীরের সংগ্রামের বিশেষ করে সামরিক কর্মকান্ডের এমন একজন প্রতীক ছিলেন যিনি নিজের মত একনিষ্ঠ শহীদগণের রক্তের প্রভাব ও ফলাফল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যিনি এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে কাশ্মীর আন্দোলন এখন পর্যন্ত জীবিত আছে। শহীদগণের রক্ত এমন এক পবিত্র সুপ্ত বিপ্লবের নাম যা ভবিষ্যতে বিপ্লবী প্রজন্ম তৈরি করতে থাকবে যারা এক পর্যায়ে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ও ইসলামকে নতুন সম্মানের জীবন দান করবেন।

শহীদগনের মর্যাদা

বাস্তবে শহীদগণ মৃত্যুবরণ করেন না। তাদের মৃত মনে করা বা কল্পনা করা জায়েজ নেই। তাদের একনিষ্ঠতা, আত্মোৎসর্গ এবং কর্মকান্ডের কল্পনার মাধ্যমেও এমন ব্যক্তিরাও নতুন বিপ্লবী শক্তি লাভ করে যারা আধ্যাত্মিক বা চারিত্রিক অধঃপতনের শিকার। অলসরা প্রাপ্ত হয় এক নতুন গতি। জন্মলাভ করে একাধিক আন্দোলন। শহীদানের পবিত্র রক্ত কোন জাতিকে দান করে নতুন জীবন। অস্ফুটবর্ণ লাভ করে শব্দ। এমনিভাবে শহীদগণের আলোচনা দান করে জীবনীশক্তি। একটি জীবন্ত বস্তু অন্য একটি জীবন্ত বস্তুর সূচনা করে। আর তাই শহীদগণ সদা জীবিত থাকেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক ক্ষমতাধররা তা অনুভব করে থাকেন।

শহীদগণের মর্যাদা ও তাদের সম্মান, তাদের উচ্চস্তরের আসীন হওয়ার ব্যাপারগুলো কুরআনে কারীম ও হাদিসে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জান্নাতে পৌঁছার পর কেউ সেখান থেকে ফিরে আসার আশা আকাঙ্খা পোষণ করবে না। কিন্তু শহীদানের আত্মা আল্লাহর কাছে নিজেদের মর্যাদা পুরস্কার সম্মান দেখে আশা করবে, হায় আমাকে যদি পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করা হতো যেন আমরা আল্লাহর রাহে আবারো নিজের জীবন উৎসর্গ করে এ ধরনের সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতাম। গাজিবাবা শহীদ অধিকাংশ সময় আল্লামা ইকবালের এই কবিতা আবৃত্তি করতেন,

আপনার স্বাধীন বান্দাগণের এই ইহকালও নয় পরকালও নয়,
ইহকালে মৃত্যুর আবশ্যকতা আর পরকালে জীবন্ত থাকার
বাধ্যবাধকতা।

আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ সা. এই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, হায় আমি যদি আল্লাহর রাহে শহীদ হতাম অথবা দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে আবারো শহীদ হতাম আবার জীবিত হয়ে যদি আল্লাহর রাহে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারতাম।

হায় যুবকেরা

আফসোস আমাদের নব প্রজন্মের জন্য, যারা শাহাদাতের স্পৃহা থেকে আজ অনেক দূরে। সংগ্রামের চেতনা তাদের মধ্যে নেই। এর বিপরীতে তারা মগ্ন থাকে দুনিয়ার চাকচিক্য, ধন-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা, ফ্যাশন, ক্রিকেট, খেলাধুলা ও রাজনীতি নিয়ে। জীবনের আসল স্বাদের ব্যাপারে আজ তারা অনুভূতিহীন। শাহাদাতের তৃপ্তি, সংগ্রামের গুরুত্ব ও মর্যাদা উম্মাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আজ তারা অনুভূতিহীন। যদিও কখনো তাদের মধ্যে সংগ্রামের চেতনা জাগ্রত হয় নামসর্বস্ব গাদ্দার জনপ্রতিনিধিগণ তাদের গণতন্ত্র বা দাজ্জালের তৈরি জাতিসংঘের মুখোমুখি করে দেয়। জাতির রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা পথভ্রষ্ট এসব নেতৃবৃন্দ ওই যুবকদের এমন চারিত্রিক ও দর্শনগত জীবন ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায় যেখানে পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছু নেই। যেখানে থাকে দুনিয়ার তীব্র ভালোবাসা ও মৃত্যুভয়। এই ভ্রান্তদর্শন যুবকদের আজ এতটা অনুভূতিহীন ও আত্মমর্যাদাহীন বানিয়ে তুলেছে যে আজ তার জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমেরিকা-ইউরোপের বস্তুবাদী জগতের অন্ধকার চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে। যে অন্ধকার গলি থেকে তাদের বের করার একমাত্র পথ হচ্ছে তাদের ইসলামের সত্যিকারের আদর্শে অনুপ্রাণীত করে তোলা।

পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা ও চিন্তার দাসত্ব

নিজেকে চেনার মাধ্যমে একজন মানুষের মানব জন্ম সার্থক হতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষ নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে যা তাকে সংগ্রামী চেতনা বা শাহাদাতে আগ্রহী ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে, আর এ

সবই আত্মবিশ্বাসের গুরুতত্ত্ব। যে শিক্ষা মানুষকে তার স্রষ্টার সাথে মিলিয়ে দেয় না, তা কোন শিক্ষাই নয়। যে শিক্ষা মানুষের চরিত্র পরিবর্তন করতে পারে না, তার সাথে স্রষ্টার সম্পর্কই বা কি। সেটা কোন শিক্ষাই নয় শিক্ষা পদ্ধতিও নয়।

বাস্তবিক অর্থে বর্তমান যুগের সকল শিক্ষা ব্যবস্থা একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। মানুষ আজ পুঁজিবাদী জগতের প্রকান্ড এক মেশিনের একটি একটি কব্জায় পরিণত হয়েছে। যা মেশিনের সাথে সাথে ঘুরতে থাকে এবং ক্ষয় হতে থাকে। পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা আজ অত্যন্ত নোংরা ও কদর্য আকার ধারণ করেছে। প্রাচীন যুগে বাধ্যবাধকতামূলক দাসত্ব বা দাসদের উপর অত্যাচারের চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ মানুষদের জীবন আজ এর চাইতেও ভয়াবহ আকার ধারণ করে দাসত্বের এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। নারীদের আজ রাস্তাঘাটে বের করে দেয়া হয়েছে আর তারা একেই নিজেদের জন্য সম্মানের ভাবছে। চিন্তা-চেতনা, কথাবার্তা, অভিরুচিসহ মানব জীবনের প্রতিটি ব্যাপারই যেন আজ দাসত্বের করাঘাতে জর্জরিত। এ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে সে বের হওয়ার কল্পনাও করতে পারে না, কেননা তার চিন্তা-চেতনাকেও তার শরীরের মত দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

শহীদ গাজিবাবা পশ্চিমা জীবনপদ্ধতি ও কৃষ্টি-কালচারকে অত্যন্ত ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন। যে জীবনব্যবস্থা বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে চারিত্রিক বা আধ্যাত্মিক কোন শক্তির মূল্যায়ন করা হয় না, যেখানে মানুষকে দোপেয়ে একটি প্রগতিশীল প্রাণী হিসেবে কল্পনা করা হয়, সেখানে পরকালের জবাবদিহিতার কোন কল্পনা নেই। গাজিবাবার জীবন পদ্ধতি ছিল ব্যবহারিকভাবে ইসলামী দর্শন এর পরিপূর্ণ মুখপত্র। তার জীবনাচার দেখে প্রত্যেকের অন্তরে যেন আশা ও আধ্যাত্মিক শক্তি অনুভূত হত।

ইসলাম প্রাকৃতিক ধর্ম

ইসলাম ধর্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বা ও সৃষ্টজগতের চর্তুপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন বস্তুর উপস্থিতিই যথেষ্ঠ। এর সত্যতার আরো একটি প্রমাণ এই যে কোন ব্যক্তি যদি একনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততার সাথে প্রকৃতি প্রদত্ত ধর্মের ওপর পরিপূর্ণভাবে আমল করে তাহলে

সে এমন ফলাফল ও পরিণতি লাভ করবে যা রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগে অর্জিত হত। ইসলাম প্রাকৃতিক ধর্ম। প্রাকৃতিক এধর্মের সাথে সৃষ্ট জগতের সমন্বয় একটি সার্বজনীন বিষয়। প্রকৃতি প্রদত্ত এ ধর্মের অনুসারী ছিলেন হযরত আদম, নূহ, মুসা, ইবরাহিম ও ঈসা আলাইহিস সালাম। প্রকৃতি প্রদত্ত এ ধর্মের ওপরে জন্মগ্রহণ করে প্রতিটি নবজাতক। এ ধর্ম প্রতিটি যুগে প্রতিটি সময় প্রতিটি স্থানে পালনযোগ্য এবং যুক্তির নিরিখে প্রমাণিত। চৌদ্দশ বছর পূর্বে এ ধর্ম আবু বকর রা. কে সিদ্দিকে আকবর, ওমর রা. কে ফারুক আজম, আলী রা. কে মুর্তাজা ও আসাদুল্লাহ ও খালেদ রা. কে সাইফুল্লাহ বানিয়েছিল। এ ধর্ম আজও ততটাই বোধগম্য ও পালনীয়। এ ধর্মের রয়েছে আজও ততটাই শক্তি, ততটাই প্রভাব। দাজ্জাল আমেরিকা যদি আজও তাদের বুদ্ধিজীবী জোসেফ এর মত লোকদের কথা মেনে নেয়, তাহলে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা বাদ দিবে। অন্যথায় কায়সার ও কিসরার মতো সম্রাটদের যে পরিণতি হয়েছিল এমন পরিণতি হবে তাদেরও। মুসলিম উম্মাহের নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। নিঃসন্দেহে প্রকৃতি প্রদত্ত ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর সর্বপ্রথম ধর্ম, এটাই হবে পৃথিবীর সর্বশেষ এমন ধর্ম যে ধর্মের নীতিমালায় পরিচালিত হবে প্রতিটি বস্তু, চাই সেটি গাছপালা হোক বা চন্দ্রসূর্য বা আকাশ জমিন।

কুরআনি মূলনীতিসমূহের দিকে ফিরে আসো

আমাদের নিজেদের পুরোপুরি ঐশী বিধান তথা আল্লাহর বিধান সমূহের সামনে অর্পিত হতে হবে। অতঃপর সৃষ্ট জগতের প্রতিটি অণুপরমাণু পর্যন্ত মানুষের সহযোগী ও সাহায্যকারী হিসেবে পরিণত হবে। পুরো মানব ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মুসা আলাইহিস সালাম এর এক প্রহার ফেরাউনের কৃত্রিম প্রভুত্বকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিল, সাহাবায়ে কেরাম কায়সার ও কিসরার মত পরাশক্তিসমূহকেও নিজেদের ঘোড়ার পদতলে অবনমিত করেছিলেন। তাই আমাদেরও সাহাবায়ে কেরামের মত জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। কুরআনে কারীমে ও পবিত্র হাদিসসমূহে অত্যাচারী শাসক জালুতের ঘটনা আজও বিদ্যমান রয়েছে। কুরআনে কারীমে যেসব ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে তাতে মানব প্রজন্ম বিশেষত মুসলমানদের জন্য চারিত্রিক গুণাবলী ও জীবন আদর্শের প্রতি দিকনির্দেশনা

রয়েছে। কুরআনে কারীমে স্পষ্ট ভাবে জীবন আদর্শ সমূহ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কুরআনি শিক্ষাসমূহ, জীবন ব্যবস্থা ও চারিত্রিক মূল্যবোধের সাথে বাস্তব জীবনের পুরো সম্পর্ক রয়েছে। কুরআনে কারীমের দর্শন অভিজ্ঞতার সাথে ইসলামী দর্শনের রয়েছে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যতা। কুরআনি দর্শন শুধু কাল্পনিক কোন দর্শনের নাম নয় বরং কুরআনের মূলনীতি সমূহ জীবন জীবনের মৌলিক বাস্তবতা সমূহ ও পৃথিবীর অবস্থাসমূহের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। মানব প্রজন্ম ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদা ও কামনা লক্ষ্য করে কুরআনে কারীম তাদের নির্দেশনা দেয়। যখন আমরা তালুত ও জালুতের কাহিনী ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি, সেখানে দেখতে পাই, তালুত নিজের সেনাবাহিনীর পরীক্ষা নিয়েছিলেন নদীর পানির মাধ্যমে। যে সকল লোকেরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল বিজয় তাদেরই পদচুম্বন করেছিল।

বর্তমানে একটি এই ধরনের পরীক্ষার নদী প্রবাহমান রয়েছে। যেটি দাজ্জালের নদী, পশ্চিমাদের বস্তুবাদী দর্শনের নদী। যতদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ এই নদীর পানি পরিত্যাগ করে এগিয়ে যেতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাজ্জালি শক্তিসমূহের মোকাবিলা করতে পারবে না। যেকোনো মূল্যে এ নদীকে এড়িয়ে যেতে হবে। তালুত তাঁর সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত প্রয়োজন সাপেক্ষে শুধু এক আঁজলা পানি পানের অনুমতি দিয়েছিলেন, আজ আমরা যারা পশ্চিমা বস্তুবাদী নীতিমালার ফাঁদে আটকা পড়েছি তাদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে তা থেকে সামান্য পরিমাণ উপকৃত হওয়া বৈধ হবে। আর সামর্থানুযায়ী নিজ ধর্মের উপর আমল করে যেতে। হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম নিজের সহচরদের বলেছিলেন মানুষেরা প্রার্থীব উপকরণাদির ওপর বেশি নির্ভর করে, ধর্মের পথে খুব কমই পরিচালিত হয়, আর তোমরা যারা আমার অনুসারী হয়েছো তোমরা ধর্মের পথে পরিচালিত হবে, ইহকালীন সাজসরঞ্জামের উপর কম নির্ভর করবে। এটিই সাহাবীগণের পথ। তাদের সাদাসিধে জিন্দেগি, তাদের সাধারণ পানাহার, জীবনের প্রতিটি কাজেই ছিল তাদের সাদাসিধে ভাব।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ পুঁজিবাদের দর্শনে ব্যবহারিক ভাবে নিজেদের আটকে ফেলেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এজীবন দর্শনের চোরাবালি থেকে নিজেদের বের করে আমরা কুরআনে কারীমের মূলনীতি ও জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে নিজেদের উপর প্রয়োগ করতে না পারব, জালুত ও দাজ্জালি শক্তিসমূহের মোকাবিলা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে।

কুরআন এ বাস্তবতাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পন্থায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে, যে হক অবশ্যই বিজয়ী হবে বাতিল নিঃসন্দেহে মুছে যাবে। হক নিশ্চয়ই বাতিলের মাথা কুচলে দেয়। এটিই প্রকৃতির নিয়ম। যদি এমনটি না হতো পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি জায়গা আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে, যেত এমনকি ইবাদতের স্থানসমূহও বিলীন হয়ে যেত।

সংগ্রামের দাওয়াতের আলোক রশ্মি

গাজিবাবা এর মত ব্যক্তিত্বরাই কাশ্মীরি সংগ্রামী দাওয়াতের ব্যপক প্রচলন করেছিলেন। তাঁরা কখনো নিচু হতে দেননি সংগ্রামের পতাকা, ইসলামের ঝান্ডা। এক হাত কেটে গেলেও দ্বিতীয় হাত সে আধ্যাত্বিক পতাকা সামলে নেয়। সংগ্রাম একটি সম্মানিত আধ্যাত্বিক লড়াই যা পবিত্র উপকরণাদি, পবিত্র নেতৃত্ব ও পবিত্র লক্ষ্য উদ্দেশ নিয়ে চলে। এই আধ্যাত্মিক দর্শন প্রজন্ম প্রজন্ম ধরে লালিত হয়ে চলে। একজন গাজিবাবা ইন্তেকাল করলে হাজারো গাজিবাবা তার স্থান দখল করে। এই সংগ্রামী দাওয়াত ও এ রহস্যপূর্ণ আহ্বান মানবীয় বুদ্ধির বাইরে। যা বুঝার জন্য ব্যথিত অন্তর আধ্যাত্মিক শক্তি ও সত্যপ্রতিষ্ঠার নিরন্তর আগ্রহ প্রয়োজন। মানবিক চাহিদা সম্পন্ন অন্তর এ রুহানি আধ্যাত্মিক রহস্য অনুভব করতে পারে না।

মানুষের আগ্রহ ও অন্বেষণের তীব্রতাই তাকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। পশ্চিমা বস্তুবাদী দর্শন, চিন্তা ভাবনা ও অভিরুচি আজ আমাদের অসুস্থ বানিয়ে তুলেছে। আমাদের এই অসুস্থতার চিকিৎসা একমাত্র কুরআনে কারীম, সুন্নতে নববী ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন দর্শনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীন কুরআনীয় নববী শিক্ষাকে শুধু নিজেদের চিন্তাভাবনাতেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি বরং নিজেদের অন্তর ও বাহ্য কাঠামোতেও এ শিক্ষার আলো ধারণ করে এর জীবন্ত নমুনায় পরিণত হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আমাদের মতই মানুষ ছিলেন, কিন্তু তারা সত্যকে দেখেছেন সত্যকে অনুভব করেছেন এবং একনিষ্ঠভাবে তার উপর আমল করেছেন। কুরআন আজও পরিপূর্ণ অবিকল তেমনি রয়েছে, আজও তা অনুভব করা যায়, তার নির্দেশনাকে কাজে পরিণত করা যায় যেমনটি অতীতে ছিল।